*আরিয়ান মল্লিক ওয়াসি*

*ক্যাশিয়ার, ছায়ান্বিত ’২৬*

**ছায়ান্বিত '২৬ নামা**

একটি বিদায় অনুষ্ঠানের আদ্যোপান্ত

**সূচিপত্র**

| **নং** | শিরোনাম | **পৃষ্ঠা** |
| --- | --- | --- |
| **১।** | ভূমিকা | 4 |
| **২।** | কীভাবে শুরু |  |
| **৩।** | প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র সভা |  |
| **৪।** | উন্মুক্ত মিটিং সমুহ… |  |
| **৫।** | নামের জন্ম! |  |
| **৬।** | ক্যাশিয়ার কে হবে? / “তোহফা এলাহী” |  |
| **৭।** | কমিটি নির্ধারণ |  |
| **৮।** | টাকা কারা তুলবে? |  |
| **৯।** | শুরু হলো প্রকৃত আয়োজন |  |
| **১০।** | ওয়েবসাইট তৈরি |  |
| **১১।** | মার্চেন্ডাইজ শপ |  |
| **১২।** | কুপন বই তৈরি |  |
| **১৩।** | ব্যানার তৈরি |  |
| **১৪।** | রিল বানানো |  |
| **১৫।** | বাজেট নির্ধারন |  |
| **১৬।** | ব্যানার কই? |  |
| **১৭।** | থিম সং |  |
| **১৮।** | এমারজেন্সি কুপন বই! |  |
| **১৯।** | “জনাব তানভীর” |  |
| **২০।** | ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন ও বুস্টিং |  |
| **২১।** | টাকা নিয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা |  |
| **২২।** | স্পন্সর লিস্ট তৈরি ও স্পন্সর লেটার পাঠানো |  |
| **২৩।** | স্কয়ার থেকে কল ও সেদিনের মুহুর্ত |  |
| **২৪।** | সবাইকে কল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা |  |
| **২৫।** | খাবারের সন্ধানে |  |
| **২৬।** | বিভিন্ন ধাপে কমিটি থেকে ছাটাই |  |
|  |  |  |

## ভূমিকা

প্রথমে আসি- বিদায় অনুষ্ঠান কী? আর এটি কেন করা হয়?

বিদায় অনুষ্ঠান বা বিদায় সংবর্ধনা এখন বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি কেবল একটি রীতি নয়, বরং এটি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর এক আবেগঘন মুহূর্ত যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এক সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। শিক্ষা জীবনের একটি অধ্যায় যখন শেষ হয়, তখন সেই অধ্যায়ের মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, স্মৃতিগুলোকে গুছিয়ে রাখা, এবং নতুন পথে যাত্রার আগে শেষবারের মতো সবার মুখ দেখা- এই অনুষ্ঠান যেন সেই সব কিছুরই প্রতীক।

বিদায় অনুষ্ঠান মানেই কেবল আনন্দ নয়; এর ভেতরে থাকে এক মিশ্র অনুভূতি। একদিকে সাফল্য এবং গর্ব, কারণ আমরা একটি দীর্ঘ যাত্রা শেষ করেছি। অন্যদিকে থাকে হালকা বিষণ্ণতা কারণ যাদের সঙ্গে প্রতিদিনের হাসি, ক্লাস, পরিশ্রম, তর্ক-বিতর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সেই মানুষগুলো থেকে আজ আমরা দূরে যেতে চলেছি। আবার সবার মধ্যেই রয়েছে আগামী পরীক্ষা নিয়ে সংশয়। এই মুহূর্তগুলোই আমাদের জীবনের এক অমূল্য অধ্যায় হয়ে থেকে যায়।

একটি বিদায় অনুষ্ঠান শুধু শিক্ষার্থীদের আবেগের কেন্দ্র নয়, এটি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মূল্যবোধ হস্তান্তরেরও একটি অনন্য সুযোগ। সিনিয়রদের বিদায়ের মাধ্যমে জুনিয়ররা অনুপ্রেরণা পায়, শেখে দায়িত্ব, ঐক্য ও আত্মত্যাগের মানে। অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের এক সেতুবন্ধন, যেখানে ভাগ করে নেওয়া হয় অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের গল্প। এটি এমন একটি মুহূর্ত যা আমাদের শেখায়- সময় থেমে থাকে না, কিন্তু সম্পর্ক, শ্রদ্ধা ও স্মৃতি সময়ের সীমা ছাড়িয়ে বেঁচে থাকে চিরকাল।

কিন্তু একটি বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা মানে শুধু একদিনের উৎসব নয়। এটি এক বিশাল প্রক্রিয়া যার মধ্যে থাকে শত শত ছোট-বড় সিদ্ধান্ত, অসংখ্য মিটিং, রাতজাগা পরিকল্পনা, হাসির ফাঁকে ক্লান্তি, বন্ধুত্ব, দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা। একেকজনের দায়িত্ব, কারো স্বপ্ন, আর কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে এটি হয়ে ওঠে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

“ছায়ান্বিত ’২৬ নামা” সেই অভিজ্ঞতারই দলিল। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠানের গল্প নয়; এটি সেই সময়ের প্রতিটি অনুভূতির সাক্ষী। এখানে আছে আমাদের সংগ্রাম, একাগ্রতা, ভুল, শেখা, ও সফলতার গল্প। আমরা কীভাবে একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি, কীভাবে অনিশ্চয়তার ভেতর থেকেও নিজেদের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রেখেছি, আর কীভাবে শেষ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে উঠেছে, সবই এই বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

তাই "ছায়ান্বিত '২৬ নামা" কেবল একটি অনুষ্ঠানপঞ্জি নয়; এটি আমাদের ব্যয়িত সময়ের প্রতিফলন, আমাদের কয়েকজনের বন্ধুত্বের অমর স্মৃতি, এবং আমাদের কলেজ জীবনের এক চিরসবুজ দলিল। এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে আমাদের হাসি, আমাদের কান্না, এবং সেই সব রাত যখন আমরা স্বপ্ন দেখেছি অসম্ভবের। এটি আমাদের পরিচয়, আমাদের ইতিহাস, এবং আগামীর জন্য নির্দেশনা ও উপদেশ। যখন আমরা বছরের পর বছর পর এই বইটি খুলব, তখন স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে আমরা আবার সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে জীবন্ত করে তুলব। এটি শুধু একটি বই নয়, এটি আমাদের সৃষ্টি, আমাদের গর্ব, এবং আমাদের চিরকালের ভালোবাসার এক স্থায়ী সাক্ষ্য।

## “জনাব তানভীর”

তানভীর আহমেদ চৌধুরী। নামটা শুনলেই একধরনের মিশ্র অনুভূতি হয়- রাগ, অবিশ্বাস, আর একটুখানি হতাশা। শুরুতে সে ছিল ঠিকঠাক, কাজ করত, কথা বলত আত্মবিশ্বাস নিয়ে, এমনকি মনে হয়েছিল, হয়তো এই ছেলেটা সত্যিই কিছু করে দেখাতে পারবে। কিন্তু সময়ই শেষমেশ প্রমাণ করল, সে কেবল কথার মানুষ, কাজের নয়।

ঘটনার শুরুটা হয় যখন আব্দুস সিয়ামকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হলো। সিয়ামের দায়িত্ব ছিল কমার্স বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি সংগ্রহ করা। তার চলে যাওয়ার পর সেই কাজটা এসে পড়ে তানভীরের কাঁধে। তখনও কেউ জানত না, এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে কী পরিমাণ ঝামেলার জন্ম দেবে।

প্রথম কয়েকদিন তানভীর নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করল, যেন এই দায়িত্ব তার জন্মগত অধিকার। সে বলত, “আমি প্রতিদিন কমার্সের ছেলেদের ফোন দিচ্ছি, সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে বলছি।” কিন্তু দিন গড়িয়ে গেলেও কেউ সেই কথার প্রমাণ দেখতে পেল না। যত কথা, তত ফাঁকা আওয়াজ।

আসলে তানভীরের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল- তার মাদকাসক্তি। সবাই জানত, সে নিয়মিত নেশা করে। রাতভর নেশা বা মদ্যপান করে সকালে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। ফলাফল? ফোনে পাওয়া যায় না, দায়িত্বের খবর নেয় না, কমিটির সঙ্গে যোগাযোগও রাখে না। এমনকি অনেক সময় এমনও শুনেছি আমরা, যে সে নাকি শিক্ষার্থীদের নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে রেজিস্ট্রেশনের করতে বলছে। এই আচরণই যথেষ্ট ছিল তাকে বাদ দেওয়ার জন্য, তবু তখনও আমরা ভেবেছিলাম- একবার সুযোগ দেওয়া যাক।

কিন্তু ১০ই অক্টোবরের রাতে যা ঘটল, সেটার পর ক্ষমা করার কোনো অবকাশই রইল না।

কমিটির সদস্যদের জন্য রেজিস্ট্রেশনের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল- সেই দিনের মধ্যে সবাইকে রেজিস্টার করতে হবে। প্রায় সবাই করে ফেলল, বাদ রইল তিনজন, তাদের মধ্যে একজন ছিল তানভীর। কিন্তু এই দেরি করার বিষয়টা আসল সমস্যার অল্প অংশমাত্র।

আসল বিপত্তি ঘটল যখন জানা গেল- ৮ই অক্টোবর তানভীর “রিহাদ” নামে একজনের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশনের টাকা নিয়েছে, কিন্তু কাউকে জানায়নি, এমনকি সেই টাকা দেয়ওনি। দুইদিন কেটে গেলেও টাকার হদিস পাওয়া গেল না। বিষয়টা জানার পর আমরা চুপ করে থাকতে পারিনি।

১০ই অক্টোবর রাতে, বিষয়টা নিয়ে চাপ দিলে তানভীর জানাল, “আমি কাল সকালে টাকা দেব, আমি তো দুইদিন ঘর থেকেই বের হইনি।” কথাটা যে মিথ্যা, সেটা তখনই বোঝা যাচ্ছিল। তাই সিদ্ধান্ত হলো, সেজান আর মিনহাজ তার বাড়ি গিয়ে সরাসরি টাকা নিয়ে আসবে। সময় ছিল সন্ধ্যা ৭টা ৩৬ মিনিট। তানভীর রাজি হলো, বলল, “ঠিক আছে, থাকছি, চলে এসো।”

বারো মিনিট পর, অর্থাৎ ৭টা ৪৮ মিনিটে, সেজান আর মিনহাজ তানভীরের বাসার সামনে পৌঁছে গেল। কিন্তু- বাড়িতে তানভীর নেই। ফোন ধরছে না, মেসেজ দেখছে না। তারা ডাকল, “তানভীইইর!” ভেতর থেকে ভেসে এলো এক ক্লান্ত কণ্ঠ, “কে?”

সেজান বলল, “আমি সেজান।” অভ্যন্তর থেকে উত্তর এল, “তানভীর তো বাসায় নেই।” কণ্ঠটা ছিল তার বাবার।

সেজান বলল, “আঙ্কেল, আপনাকেই দরকার।” কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তানভীরের বাবা- চোখে একটু বিভ্রান্তি। সেজান জিজ্ঞেস করল, “তানভীর কোথায়?”  
বাবা বললেন, “এইতো কিছুক্ষণ আগে বের হলো, কোথায় গেছে জানি না।”  
সেজান বলল “কখন ফিরবে?” তানভীরের বাবা উত্তর দিলেন “জানি না”

সেজান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন- তানভীরের কাছে কিছু রেজিস্ট্রেশনের টাকা আছে, কুপন আছে, তাই তারা নিতে এসেছে। বাবা বললেন, “সকালে আসো।”

এরপর সেজান আমাদের গ্রুপে পুরো ঘটনাটা জানাল সেখানে একটু কথা হলো। রাত ১০টা ৭ মিনিটে হঠাৎ তানভীর আমার ইনবক্সে লিখল- “Check।” চেক করে দেখি, সে সত্যি বিকাশে ১১৯৫ টাকা পাঠিয়েছে। কিন্তু এখানেও সমস্যা- প্রথমত, ৫ টাকা কম, দ্বিতীয়ত, সে বলল এই টাকা নাকি তার নিজের রেজিস্ট্রেশনের জন্য। অথচ আমরা সবাই জানি, সেটা “রিহাদ”-এর টাকা।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “বাকি টাকা কোথায়?”  
সে বলল, “হাতে নগদ টাকা আছে। সকালে দেব”  
আমি বললাম, “এখনই পাঠাও।”  
সে উত্তর দিল, “Shezan ek taratari asper koisilam” এবং “Liye gele amar r pera leua lagto nh।” অর্থাৎ, সে দাবি করছে, সে নাকি সেজানকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিল! ভাবা যায়? মাত্র দশ-বারো মিনিটের ব্যবধান, এর মধ্যেই সে বেরিয়ে গেছে! যে দুইদিন ঘর থেকে বের হয়নি, কিন্তু ঠিক যেই সময় আমরা যাচ্ছি, সেই সময়ই সে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে? কোনো খবরও দেয়নি, অপেক্ষাও করেনি? সবই তার ধোঁকা।

আমি আমার ইনবক্সের ঘটনাটা সেজানকে জানালাম, সে তানভীরের সঙ্গে ক্যাশ গ্রুপে কথা বলল। সেজান বলল, “আমরা দেরি করিনি, মাত্র ১২ মিনিটে পৌঁছেছি।”  
তানভীরের উত্তর- “E vai amar ekjaygay pora silo।”  
একটা এমন হাস্যকর অজুহাত যে শুনে হাসব না কাঁদব বোঝা যাচ্ছিল না। শুক্রবার রাতে রাত আটটার পর কোনো শিক্ষক, কোচিং বা ক্লাস খোলা থাকে- এমনটা কল্পনাই করা যায় না।

শেষে সেজান জানাল, “তোমার দায়িত্ব এখন জায়িদের হাতে। রেজিস্ট্রেশন বইটাও তাকে দিয়ে দাও। এবং রেজিস্ট্রেশনের টাকা টা দেও”  
তানভীর বলল, “আমার হাতে নগদ টাকা আছে, বিকাশে নয়। সকালে দেব”  
তখন সেজান মিনহাজকে বলল, “তুমি গিয়ে নিয়ে আসো।”  
তানভীর রেগে গিয়ে বলল, “চুপ কর তো!” এবং “তোর কি মাথা খারাপ নাকি!”

সেজান শান্তভাবে বলল, “মিনহাজের কোনো সমস্যা নেই যেতে। আঙ্কেল কিছু বললে আমরা বুঝিয়ে নেব।”  
তানভীর তখন বলল, “সকালে এসো, বাবা রেগে যাবে।”  
সেজান বলল, “তাহলে জানালা দিয়ে টাকা আর বইটা দাও।”  
তানভীরের উত্তর- “Het vudar beta janala nai eto pera dis kah ghum theke uthe wasir bkash e tk geley hoilo।”

মানে সে দাবি করছে, তার বাড়িতে নাকি জানালা নেই! এমন এক অদ্ভুত যুক্তি দিল যে মনে হয় সে আয়নাঘরে থাকে। এরপর সে চুপ করে গেল। আর কোনো উত্তর নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই ঘটনা গ্রুপে আলোচিত হলো। সবাই বলল, “তানভীরকে সরিয়ে দাও।” সিদ্ধান্তও নেওয়া হলো- তানভীরের দায়িত্ব জায়িদের হাতে দেওয়া হবে, আর যে টাকা সে পাঠিয়েছে, সেটা “রিহাদ”-এর নামেই গণ্য হবে, তার নিজের নয়।

সবাই একরকম হাসাহাসি করল, বিদ্রূপ করল, কারণ তানভীর তার নিজের আচরণেই নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছিল।  
শেষে তানভীর সেজানকে মেসেজ করল, “আগামীকাল সকাল ১১টায় কলেজের সামনে দেখা করো, একান্তে কথা বলব।”  
এরপর আর কিছুই রইল না- ঘৃণা, হতাশা আর এক নিঃশব্দ সিদ্ধান্ত ছাড়া।

তানভীরের গল্প এখানেই শেষ নয়, কিন্তু এখানেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়। যে মানুষ দায়িত্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে বারবার মিথ্যা বলে, দায়িত্বে গাফিলতি করে, এমনকি অন্যের টাকাও গোপন রাখে- তাকে আর “কমিটির সদস্য” বলা যায় না।  
তার নাম হয়তো “জনাব তানভীর”, কিন্তু আমাদের চোখে সে একদমই জনাব নয়।